Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VI, Issue-I, July 2017, Page No. 29-34
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

সমাজ ব্যবস্থায় বর্ণ বৈষম্য দরিকরণে বিবেকানন্দ

সুজিত দেবনাথ
অথিতি শিক্ষক, দর্শন বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা
পূজা দাস
অথিতি শিক্ষিকা, শিক্ষা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা

Abstract

In this paper I made an attempt to discuss how Swami Vivekananda tries to remove inequality in caste from society. Vivekananda thinks that inequality in caste in modern India is a big obstacle in the development of our society. In India caste or varna system means fourfold division of society namely Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. According to Vivekananda caste is not by birth rather it is based on quality of people. It is men who made them traditional. And gradually one caste starts to predominate over other castes. He believes that one time is coming when the weaker class will dominate over other castes. But he does not want such a society where one caste dominates over other castes. Vivekananda talks about an age when everyone was Brahman and he says that we are now live in a degenerate age. But we can get that golden age back if we strive hard enough. Swami Vivekananda wants complete annihilation of this caste system and he tries to harmonize the people through this annihilation of caste. Thus, in my writing I shall try to discuss some of his great thinking to remove this inequality in caste from society.

Key words: inequality in caste, obstacle, dominate, golden age, strive hard, complete annihilation.

ভূমিকা: ভারতীয় সামাজিক ধারায় ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য করলে সভ্যতার এক স্তরে এক এক বর্ণের প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। ভারতের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের আলোচনায় বিবেকানন্দ তার বক্তৃতা ও রচনাবলীতে অসংখ্যবার এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। পথিবীতে সাধারনণ ভাবে গুণগত বর্ণ বা জাতি চারটি যথা- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এদের মধ্যে বিদ্যা চর্চা বা জ্ঞান চর্চা যারা করেন তারা ব্রাহ্মণ। যারা যোদ্ধা এবং দেশ শাসন করে তারা ক্ষত্রিয়। যারা ব্যবসায়ী তারা বৈশ্য। আর যারা কায়িক শ্রমের দ্বারা ভোগ্য বস্তু উৎপন্ন করে তারা শুদ্র। বিবাকানন্দের মতে মানব সমাজে ক্রমান্বয়ে এই চারটি বর্ণদ্বারা শাসিত হয়েছে। তবে প্রতিটি শাসন ব্যবস্থায়ই শোষণ অব্যাহত থাকে। স্বামীজীর মতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শাসনে শোষণ সর্বাত্রক দেখা যায় না তা হয় ব্যাক্তিগত, পরিবার গত বা বড়জোর গোষ্ঠীগত। কিন্তু বৈশ্য ব্যবস্থায় এই শোষণকারী ক্ষমতা হয় বড়ই ভয়াবহ। এই শাসন ব্যবস্থায় যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতির ফলে তারা তাদের গোটা সম্প্রদায়ের স্বার্থে শোষণ চালায় অধিক মাত্রায়। স্বামীজী মনে করেন এই বৈশ্য শাসন ব্যবস্থার পরবর্তীকালে কালের পর্যায় ক্রমিক নিয়মনুসারে শূদ্র শাসন যুগের আবির্ভাব হবে। তিনি মনে করেন প্রথম তিনটির (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) পালা শেষ হবার পর শূদ্র যুগ

আসবেই আসবে- এ কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। উল্লেখ্য যে এক্ষেত্রে শূদ্র শব্দটিকে মজুর অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। শূদ্র শাসন ব্যবস্থার গরীবরা তাদের অসমান জীবন সংগ্রাম থেকে অনেকটা সুবিধা পাবে। কিন্তু বিবেকানন্দ এই শূদ্র শাসন ব্যবস্থাকে সবচেয়ে উন্নত একটি শাসন ব্যবস্থা বলেননি। বরং তাঁর ইচ্ছা হল সমাজের প্রতিটি বর্ণ যখন তাদের নিজ নিজ কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে এক উন্নত চিন্তায় পৌঁছাতে পারবে তখন সেই ব্যবস্থাটাই হবে আদর্শ সমাজ। এইভাবে আমি আমার এই আলোচনাতে দেখাতে চেষ্টা করব যে বিবেকানন্দ কিভাবে বর্ণ বৈষম্য উচ্ছেদের মাধ্যমে এক উন্নত সমাজ ব্যবস্থার চিন্তা করেছেন।

বিভিন্ন বর্ণ শাসিত শাসন ব্যবস্থা : বিবেকানন্দ মনে করেন ভারতবর্ষে সমাজ ব্যবস্থা তিনটি বর্ণ দ্বারা শাসিত হয়েছে। এই তিনটি বর্ণ হচ্ছে পুরোহিত (ব্রাহ্মণ), সৈনিক (ক্ষত্রিয়), ও ব্যবসায়ী (বৈশ্য) এবং মনে করেন আরেকটি শাসন যুগের আবির্ভাব আবশ্যম্ভাবি সেটি হচ্ছে শূদ্র শাসন বা মজুর শাসন।

এই চারটি বর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে সমাজ ব্যবস্থার আদি অধ্যায়ে রয়েছে ব্রাহ্মণ শাসন, ব্রাহ্মণরা মানব সভ্যতার সৃষ্টিকারী ত্যাগ, তপস্যা ও বিদ্যায় এই ব্রাহ্মণরা শ্রেষ্ঠ। এই পুরোহিত বা ব্রাহ্মণ শক্তির ভিত্তি নির্ভর করে বুদ্ধিবলের উপর বাহু বলের উপর নয়। এইজন্য পুরোহিত দিগের প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভাব হয় বিদ্যাচর্চার। তখন তাদের এই বিদ্যা ও চিন্তার স্থানে সাধারণের প্রবেশ ছিল অনেকটা অসম্ভব।স্বত্ত্বগুণ প্রধান পুরুষেরা সেই রাজ্যে থাকেন বার্তা আনেন ও অন্যকে পথ প্রদর্শন করেন। আর এই স্বত্ত্বগুণ প্রধান পুরুষেরাই হলেন পুরোহিত। মানব সমাজের প্রথম গুরু, নেতা ও পরিচালক। কিন্তু এই পুরোহিত শাসনে গুণ যেমন আছে তেমনি দোষ ও যথেষ্ট। বিবেকানন্দের মতে পুরোহিত শাসনে বংশগত ভিত্তিতে ঘোর সংকীর্ণতা রাজত্ব করছিল। তাদেরও তাদের বংশধরগণের অধিকার রক্ষার জন্য চারদিকে তারা গণ্ডি দিয়ে রেখেছিল। তারা ছাড়া বিদ্যা শিখবার অধিকার কারও ছিলনা। প্রণবরঞ্জন ঘোষের ভাষায় , "প্রাচীন শাস্ত্রের বা ঐতিহ্যের প্রামান্য ধরে যে শাসন ববস্থা তার উপর প্রজাদের সম্মিলিত ইচ্ছার কোন প্রভাব থাকতো না। পুরোহিততন্ত্রের বা রাজতন্ত্রের একান্ত প্রভাবধীন প্রজাশক্তি, কেবল 'পালিত' ও 'রক্ষিত' হয়ে নিজেদের অন্তর্নিহিত শক্তির কথা ভুলেই ছিল। আবার প্রাচীন যুগে রাজশক্তি ও প্রধানত পুরোহিত শক্তির অধীনে। ফলে আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়ে গণশক্তিকে পদানত রাখা পুরোহিতদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।"[১] কিন্তু এই যুগের একটি অন্যতম গুরুত্ব এই যে পুরোহিতরা তাদের বুদ্ধিবলে বিভিন্ন বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপনা করেছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই পুরোহিত শক্তির সঙ্গে বহুকাল ব্যাপি সংঘর্ষের পর শেষ পর্যন্ত ক্ষত্রিয় রাজশক্তিরই প্রাধান্য দেখা দেয়। এই ক্ষত্রিয় শাসনের সময় ঐহিক সভ্যতার উন্নতি ঘটে। অরণ্য সভ্যতার স্থান অধিকার করে চারু কলা সমন্বিত সভ্যতা। এই সভ্যতায় প্রাকৃতিক কানুন, জঙ্গল স্থূল বেশ ভূষাদির স্থান অধিকার করতে লাগে। লক্ষ লক্ষ বুদ্ধিজীবী পরিশ্রম বহুল কৃষিকার্য ত্যাগ করে অল্পশ্রমসাধ্য ও সূক্ষ্ম বুদ্ধির রঙ্গভূমি শত শত কলায় মনোনিবেশ করে। এই সভ্যতায় শ্রমের গৌরভ লুপ্ত হয়ে নগর সভ্যতার আবির্ভাব হতে শুরু হয়। এই ক্ষত্রিয়রা বিজ্ঞান ও স্বাধীনতার পরিপোষক, দেশ-থেকে কুসংস্কার দূরীকরণের পক্ষপাতী। ক্ষত্রিয়রা যখন জ্ঞান চর্চা করেছেন তখন সর্বোচ্চ তত্ত্ব তাদের কাছ থেকেই পাওয়া গেছে। তারা উপনিষদ, গীতার প্রবক্তা। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ এরা সবাই ক্ষত্রিয় ছিলেন। স্বামীজীর মতে, "ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় ক্ষত্রিয় নৃপতিরা অনেকেই পরবর্তীকালে একাধারে দার্শনিক ও শাসক। পৌরানিক যুগের রাম বা কৃষ্ণ এবং ঐতিহাসিক যুগের বুদ্ধ বা মহাবীর-এঁরা ক্ষত্রিয় বংশজাত এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতিনিধি।"[২] ক্ষত্রিয়রা ভোগবাদী সভ্যতার যেমন প্রবর্তক, তেমনি তারাই ভোগে বীতস্পৃহ হয়ে ভোগবৌরাগ্য তত্ত্ব প্রবর্তন করেছেন বিবেকানন্দ বলেছেন, ক্ষত্রিয়রাই চিরকাল ভারতের মেরুদণ্ড স্বরূপ; তারাই বিজ্ঞান ও স্বাধীনতার পরিপোষক। দেশ থেকে কুসংস্কার দূরীভূত করার জন্য বারংবার তাদের বজ্রকণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছে আর ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম তারাই পুরোহিত কুলের অত্যাচার থেকে সাধারণকে রক্ষা করার অভেদ্য প্রাচীররূপে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন।"[৩] ক্ষত্রিয় শাসন যুগে যদিও শিল্পের ও সামাজিক কৃষ্টির চরম উন্নতি সাধন হয় কিন্তু এই ক্ষত্রিয় শাসন বড়ই নিষ্ঠুর ও অত্যাচার পূর্ণ যা আমরা ইতিহাসের পাতায় সদাই দেখতে পাই।

কালক্রমে দেখা দেয় বৈশ্য শাসনযুগ, ব্রাহ্মণ যেখানে নিজেদের বিদ্যা বলের অধিকারি দাবি করে, ক্ষত্রিয় বাহুবলের অধিকার জানায়, সেখানে বৈশ্যের বক্তব্য প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন "বৈশ্য বলিতেছেন উন্মাদ! অখণ্ড মণ্ডলাকার;, ব্যাপ্ত; যেন চরাচর:- তোমরা যাহাকে বলো, তিনিই এই মুদ্রারূপী অনন্ত শক্তিমান আমার হস্তে। দেখ, ইহার কৃপায় আমিও সর্বশক্তিমান। হে ব্রাহ্মাণ! তোমার তপ জপ বিদ্যাবুদ্ধি ইহারই প্রসাদে আমি এখনই ক্রয় করিব। হে মহারাজ, তোমার অস্ত্র সস্ত্র, তেজ বীর্য ইহারই কৃপায় আমার অভিমত সিদ্ধির জন্য প্রযুক্ত হইবে। এই যে অতিবিস্তৃত, অত্যুন্নত কারখানা সকল দেখিতেছ, ইহারা আমার মধুক্রম। ঐ দেখ অসংখ্য মক্ষিকারূপী শূদ্রবর্ণ তাহাতে অনবরত মধু সঞ্চয় করিতেছে। কিন্তু মধু পান করিবে কে?- আমি পশ্চাদেশ হইতে সমস্ত মধু নিপীড়ন করিয়া লইতেছি।"[৪] স্বামীজীর মতে ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনের অবসানে ইংরেজরা তথা বণিক শ্রেণির যে শাসন শুরু হয় সেটাই হল বৈশ্য শাসন। তাঁর মতে বৈশ্যদের বাণিজ্যের দ্বারা কেবল ইংল্যান্ড প্রমুখ আধুনিক পাশ্চাত্য জাতি দিগের মধ্যেই প্রথম ঘটিয়েছে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে কেবল ধনতান্ত্রিক ইংরেজ জাতিকেই বৈশ্যজাতি বলেননি। বরং তিনি অন্য কয়েকটি পাশ্চাত্য জাতিকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। স্বামীজীর মতে এই বৈশ্য শাসন ব্যবস্থার বাইরে যদিও প্রশান্ত ভাব কিন্তু এর শোষণকারী ক্ষমতা বড়ই ভয়াবহ। স্বামীজীর মতে, "এর ভেতরে শরীর নিষ্পেষণ ও রক্ত শোষণকারী ক্ষমতা অথচ বাইরে প্রশান্ত ভাব- বড়ই ভয়াবহ।"[৫] বিবেকানন্দ বৈশ্য শাসনের শোষণের একটি দিককে উদ্ঘাটিত করতে গিয়ে বলেছেন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শাসনে শোষণ সর্বাত্মক থাকে না তা হয় ব্যাক্তিগত বা পরিবারগত বা গোষ্ঠীগত। কিন্তু বৈশ্যরা একটি বিরাট সম্প্রদায়, তাই এক্ষেত্রে শোষণের মাত্রা হয় অধিক। তাছাড়া বৈশ্যরা সাম্রাজ্যবাদী হওয়ার তাদের শোষণের মাত্রা হয় সর্বাধিক। স্বামীজী বলেন, "...ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শাসনে শোষণ সর্বাত্মক ছিল না - তা ব্যাক্তিগত, পরিবারগত, বড়জোড় গোষ্ঠীগত। কিন্তু বৈশ্যরা একটি বিরাট সম্প্রদায়, সুতরাং সম্প্রদায়ের স্বার্থে শোষণ করা হয়। আবার বৈশ্য শাসন যখন সাম্রাজ্যাবাদী, তখন একটা গোটা জাতির স্বার্থে পরাধীন জাতিকে শোষণ করা হয়।"[৬] বিবেকানন্দ মনে করেন, যেহেতু প্রতিটি শাসন যুগেই শোষণ অব্যাহত তাই কালের পর্যায়ক্রমিক নিয়মে শূদ্র শাসন বা শ্রমিক শাসনের আবির্ভাব হবেই। তিনি বলেন যেহেতু প্রথম তিনটির পালা শেষ হয়েছে তাই এবার শেষেরটির পালা। শূদ্রযোগ আসবেই। স্বামীজীর ভাষায়, "ইতিহাসের অমোঘ বিধানে শূদ্র শাসন আসবেই।" এই শাসন ব্যবস্থায় গরীবরা অনেকটাই সুবিধা পাবে। বিবেকানন্দের এরূপ মন্তব্যের সাথে সমাজতন্ত্রের (Socialism) একটা বিশেষ মিল পরিলক্ষিত হয়। সর্বহারাদের একনায়কত্বের যে ভবিষ্যদ্বাণী মার্কস ও এঙ্গেলস করেছিলেন তার সঙ্গে বিবেকানন্দের এই মন্তব্য তুলনীয়। অর্থাৎ মার্কস ও যেমন উন্নতমানের সমাজ তথা শ্রমিক শ্রেণির শাসনের কথা চিন্তা করেছেন। তেমনি বিবেকানন্দ ১৮৯৬ বা তার আগে থেকেই শূদ্র প্রাধান্যের কথা চিন্তা করেছেন। যদিও বিবেকানন্দ সমাজতন্ত্রবাদকে সর্বোচ্চ মতবাদ বলেননি বরং তিনি সেখানে প্রচলিত অন্যান্য সামাজিক ব্যবস্থার চেয়ে সমাজতান্ত্রিক অপেক্ষাকৃত ভালো মনে করেছেন।

স্বামীজী বুঝতে পেরেছিলেন যে ভাবি শূদ্র শাসনে দোষগুণ উভয়ই থাকবে। এই শাসন ব্যবস্থার দোষ দেখাতে গিয়ে তিনি বলেছেন হয় তো এই শাসন ব্যবস্থায় সংস্কৃতির অবনমন হবে, এবং আসাধারণ প্রতিভাশীল ব্যাক্তির সংখ্যা কমে যাবে। কিন্তু তদুপরি তিনি এরমধ্যে ধনীর শোষণ থেকে দরিদ্রের মুক্তি দেখতে পেয়েছিলেন। তাই এই জগত বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শূদ্র শাসন তার কাছে স্বীকার্য। তাই একে স্বাগত জানাতে গিয়ে বলেছেন "নতুন ভারত বেরুক! বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান হতে, ভূনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে নীরবে সয়েছে- তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে উলটে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না, এরা রক্ত বীজের প্রাণ-সম্পন্ন। আর পেয়েছে, অদ্ভুত সদাচার-বল, যা ত্রৈলোক্যে নেই। এত শান্তি এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম!! অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার

রত্নপেটিকা, তোমার মানিকের আংটি-ফেলে দাও এদের মধ্যে। যত শীঘ্র পার ফেলে দাও। আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কান খাড়া রেখো; তোমার যাই বিলীন হওয়া, আমনি শুনবে কোটি জীমুতস্যন্দী ত্রৈলোক্য কম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন ধ্বনি- 'ওয়াহ গুরু কি ফতে।"[৮]

স্বামীজীর উপরিউক্ত বাক্যগুলি দ্বারা তাঁর অবহেলিত শ্রমিক শ্রেণির প্রতি ভালবাসাই ফুটে উঠেছে। যদিও তিনি এই শূদ্র শাসনকেও একমাত্র সর্বোচ্চ শাসন ব্যবস্থা বলেননি। তবুও তিনি বলেছেন এই শাসন অবহেলিত নিপীড়িত শ্রমিক শ্রেণি তাদের অধিকার ফিরে পাবে। তাই তিনি ভাবি শূদ্র শাসনকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন "এমন সময় আসিবে যখন শূদ্রত্বের সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য প্রকাশ করিতেছে, তাহানহে, শূদ্রধর্ম- সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাসটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল। সোস্যালিজম্, এনার্কিজ্ম, নাইহিলিজ্ম প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা।"[৯]

বর্ণ-বৈষম্যহীন ও শোষণহীন এক উন্নত সমাজই বিবেকানন্দের লক্ষ্য: অন্যান্য শাসন ব্যবস্থা থেকে শূদ্র শাসনকে যদিও তিনি উন্নত পর্যায়ের বলেছেন তবুও শূদ্র শাসনকে কখনই তিনি সর্বোচ্চ পর্যায়ের বলে মনে করেননি বরং তিনি শূদ্র বা সর্বাহারাদের যুগে ও যদি সমাজের সর্বাঙ্গীন না হয় তা হলে ও পরিবর্তন হয়ে যাবে। স্বামীজীর মতে, শূদ্র বা সর্বহারাদের যুগে ও যদি সমাজের সর্বাঙ্গীন বিকাশ না হয়, তাহলে এর ও পরিবর্তন হতে পার।"[১০] তাছাড়া তিনি নিজেই বলেছেন যে শূদ্র শাসন ব্যবস্থা বিভিন্ন দিক থেকে উন্নতর হলেও এই শাসন যুগে সংস্কৃতির অবনমন ঘটবে। স্বামীজী বলেন, "শূদ্রযুগে সংস্কৃতির মান অবনমিত হবে।"[১১] তাই শূদ্র শাসন ব্যবস্থা ও তাঁর কাম্য নয় বা তাঁর মতে এটি আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা নয়। এই ভারতবর্ষের বর্ণ, ভাষা, ধর্ম সংস্কার এবং সামাজিক উচ্চভিলাষ প্রভৃতির বিপরীত প্রভাবে বিবাদমান গোষ্ঠীতে বিচ্ছিন্ন। তিনি মনে করেন এই ভারতবর্ষকে বিরাট সংঘবদ্ধ জাতিতে গড়ে তোলাই হল প্রকৃত সমস্যা। বিবেকানন্দ বলেন এই বিভিন্ন শ্রেণি বা গোষ্ঠী চির কালই রয়েছে ও থাকবে। কিন্তু প্রত্যেক শ্রেণির (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) সদগুণ গুলির সমন্বয়ে এক নতুন আদর্শ সমাজ গড়ে তুলতে হবে। সুতরাং জগতের ইতিহাসে যতই শ্রেণিতে শ্রেণিতে সংগ্রাম, বিভিন্নতা থাকুক না কেন বিবেকানন্দের লক্ষ্য হল সব জাতির মধ্যে সমন্বয় সাধন। সমাজ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রত্যেকেরই নিজস্ব ভূমিকা তিনি স্বীকার করেছেন। কাজেই এঙ্গেলস যেমন শ্রেণিহীন শোষনহীন এক উন্নত সমাজ ব্যবস্থার কল্পনা করেছেন বিবেকানন্দের সর্বশ্রেণির শ্রেষ্ঠ দিকগুলির সমন্বয়ের কল্পনাটি ও সে রূপ একটি বৈষম্যহীন, শোষণহীন এক উন্নত সামাজিক চিন্তার পরিচায়ক।

উপসংহার: উপরিউক্ত আলোচনা থেকে ইহা স্পষ্ট যে স্বামী বিবেকানন্দ কোন বিশেষ বর্ণ বা শ্রেণির শাসন ব্যবস্থাকে শ্রেষ্ঠ শাসন ব্যবস্থা বলেননি। বরং স্বামীজীর ভবিষ্যৎদৃষ্টি শূদ্র যুগকে ও অতিক্রম করে গেছে। আদর্শ ব্রাহ্মণকে আদর্শ মানবরূপে কল্পনা করে তিনি বলেছেন সমস্ত জগৎকে ব্রাহ্মণের আদর্শে গড়ে তোলাই আমাদের সাধনা হওয়া উচিৎ। এখানে ব্রাহ্মণ শব্দটি ব্রহ্মজ্ঞানী বা ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য সচেষ্ট ব্যক্তি অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে । তিনি বলেছেন " আবার যখন যুগচক্র ঘুরে সেই সত্য যুগের অভ্যুদয় হবে, তখন আবার সকলেই ব্রাহ্মণ হবেন।"[১২] বিবেকানন্দ দেশের দরিদ্র, পতিত ও অশিক্ষিতের মধ্যেই ভবিষ্যৎ নতুন ভারতের সম্ভাবনা দেখেছেন বেশি। তাই সকলকে ব্রাহ্মণের আদর্শে গড়ে তোলার কথার দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে প্রতিটি পিছিয়ে পরা জাতিকেই এগিয়ে নিয়ে আসতে হবে। সবগুলো বর্ণের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে যখনই প্রতিটি বর্ণ তাদের নিজ নিজ কর্তব্য ও দায়িত্ব সুষ্ঠ ভাবে পালন করবে তখনই গড়ে উঠবে একটি আদর্শ সমাজ। স্বামীজীর এই উক্তিটি প্লেটোর কার্ডিনাল ভার্চুর আলোচনার সাথে তুলনীয়। যেখানে প্লেটো বলেছেন সমাজে জাস্টিস তখনই স্থাপিত হয় যখন অন্যজাতিগুলো ঠিকভাবে তাদের কর্তব্য পালন করে। প্লেটোর মতে, it is realized when the rulers govern wisely, the soldiers fight bravely, and the craftsmen traders work with energy and thrift."[১৩]

এই ভাবে বিবেকানন্দ একটি আদর্শ কল্পনায় বলেছেন এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায় , ব্রাহ্মণ যুগের জ্ঞান ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা বৈশ্যের সম্প্রসারণ শক্তি এবং সাম্যের আদর্শ এই সবগুলি ঠিক ঠিক বজায় থাকবে, অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তাহলে তা হবে একটি আদর্শ রাষ্ট্র।"[১৪] এইভাবে বিবেকানন্দ সমাজ ব্যবস্থা থেকে বর্ণবৈষম্য দূরিকরণের মাধ্যমে এবং প্রতিটি বর্ণের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যেমে একটি আদর্শ সমাজব্যবস্থার কথা বলেছেন।

তথ্যসূচি:

১) ঘোষ, প্রণবরঞ্জন, বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-১২, তৃতীয় সংস্করণ-১৩৮৫, পৃষ্ঠা-৩৬৭।
২) ঐ, পৃষ্ঠা-৩৬৬।
৩) বসু, শঙ্করী প্রসাদ, বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, মন্ডল বুক হাউস,মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা- তৃতীয় মুদ্রণ-১৯৮৩, পৃষ্ঠা-৪৫০।
৪) ঐ, পৃষ্ঠা-৪৫০।
৫) ঘোষ, প্রণবরঞ্জন, বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-১২, তৃতীয় সংস্করণ-১৩৮৫, পৃষ্ঠা-৪৫০।
৬) বসু, শঙ্করী প্রসাদ, বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, মন্ডল বুক হাউস,মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা- তৃতীয় মুদ্রণ-১৯৮৩, পৃষ্ঠা- ৪৫০।
৭) ঐ, পৃষ্ঠা-৪৫১।
৮) ঐ, পৃষ্ঠা- ৪৫৪।
৯) স্বামী বিবেকানন্দ বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, নাভানা প্রিন্টিং; ওয়ার্কার্স প্রাইভেট লিমিটেড ৪৭ গণেশ চন্দ্র অ্যভিনিউ, কলকাতা-১৩, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা- ২৪১।
১০) ঘোষ, প্রণবরঞ্জন, বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-১২, তৃতীয় সংস্করণ-১৩৮৫, পৃষ্ঠা-৩২৮।
১১) ঐ, পৃষ্ঠা-৩২৭।
১২) ঘোষ, প্রণবরঞ্জন, বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-১২, তৃতীয় সংস্করণ-১৩৮৫, পৃষ্ঠা-৩৪৪।
১৩) Sinha, Jadunath, A Manul of ethics, new central book agency, (p) ltd., Kolkata, 2009, p.295.
১৪) বসু, শঙ্করী প্রসাদ, বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, মন্ডল বুক হাউস,মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা- তৃতীয় মুদ্রণ-১৯৮৩, পৃষ্ঠা-৪৫৫।

গ্রন্থপঞ্জী:

১। দত্ত, ডঃ ভূপেন্দ্র নাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, নব ভারত পাবলিশার্স, ৭২ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৯ তৃতীয় মুদ্রণ-১৯৮৩।
২। ঘোষ, প্রণবরঞ্জন, বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-১২, তৃতীয় সংস্করণ-১৩৮৫।

৩। বসু, শঙ্করী প্রসাদ, বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, মন্ডল বুক হাউস,মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা- তৃতীয় মুদ্রণ-১৯৮৩।

৪) স্বামী বিবেকানন্দ বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, নাভানা প্রিন্টিং; ওয়য়ার্কার্স প্রাইভেট লিমিটেড ৪৭, গণেশ চন্দ্র অ্যভিনিউ, কলকাতা-১৩, ১৯৭৭।

৫। স্বামী বিবেকানন্দ বাণী ও রচনা, দশম খণ্ড, উদ্ভোধন কার্যালয় কলিকাতা, ১৯৭৭।

৬। Sinha, Jadunath, A Manul of ethics, new central book agency, (p) Ltd., Kolkata, 2009.